কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠী : ভালোবাসার সঙ্গে যাঁর একমাত্র বন্ধুত্ব - নীলাঞ্জন কুমার
প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা যারা কবিতার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছি যার যার মতো করে, তাদের মধ্যে বহু কবিতা লেখককে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডাখানায় বলতে শুনেছি, তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ভবিষ্যৎ কাকে কাকে প্রধান কবি হিশেবে বেছে নেবে এই নিয়ে কখনো সখনো নাম করেও তাঁরা প্রেডিকশনও করেন। অবশ্য তার সঙ্গে মনের মধ্যে এ ভাবনাও হয়তো উঁকি মারে, তাঁর নিজের কবিতারও কি কখনো মূল্যায়ন হবে ? তাঁর মতো কি কেউ কেউ তাঁকে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তাঁর প্রধান কবি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা যায় এটা অত্যন্ত সাধারণ প্রবণতা। বেশির ভাগ কবিদের মধ্যে লক্ষ করেছি, তাঁরা নিজেরা যত নিজের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে ভালোবাসেন ঠিক ততখানি অন্য কবিদের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ থাকা পছন্দ করেন। এই আত্মকেন্দ্রিকতা কি আমাদের এগোনোর পথে সহায়ক, না পিছিয়ে পড়ার? এ প্রশ্নের উত্তরে গিয়ে বুঝতে পারি, বহু কবি এখনই সব কিছু পেতে চান আর নির্বোধের মতো ভাবেন, কবিতা নিয়ে অবশ্য অবশ্যই তিনি অমরত্ব লাভ করবেন, যশ প্রতিষ্ঠা নামা 'শুকরী বিষ্ঠা' পাবেন। এ সব আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার উৎস যা কবিকে পিছিয়ে দিতে বাধ্য।

জীবনের কোথা থেকে কখন কবিতা বেরিয়ে আসে আমাদের অজানা। আমরা কেবল কবিতার জন্য সাধনা করে যেতে পারি, অন্য কিছু নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আঘাত করতে করতে যখন কবিতা লেখার প্রবণতার বিস্তার হয়, তখন একজন কবি প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। সে আনন্দের কাছে অন্য কিছুর দাম নেই। আশা করা যায়, কোন প্রকৃত কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি সে কবিতা কার জন্য লিখবেন কিংবা কোন বিখ্যাত পত্রিকায় লিখবেন তা না ভেবেই লেখেন। কবিতা লেখার পরে তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলে তারপর ওসব অবাঞ্ছিত কবিতা লিখে আনন্দ পান তখন তাঁর সঙ্গী একমাত্র তিনি ও তাঁর ওই কবিতাটি। প্রচার ও হট্টগোলের বাইরের যে জগৎ সেখানে অসম্পৃক্ত মনকে সম্পৃক্ত করা যায় আর এই সম্পৃক্ততা থেকে আসে কবিতা। আমরা যদি একটু গভীর ভাবে সব কিছু অনুধাবন করি তবে সেখানে কবিতা বাদে সব কিছু বেঁচে থাকার জন্য তাৎক্ষনিক প্রয়োজন বলে মনে করি।

২.

উপরোক্ত কথাগুলির সমর্থন পেয়ে যাই এ সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর এই প্রার্থনা কবিতার বইটির প্রথম কবিতাটিতেঃ

'এই প্রার্থনা
মহান প্রকাশকবর্গ যেন দয়া না করেন
মহান পোষকবৃন্দ যেন স্নেহ না করেন
মহান কবিকুল যেন পিঠ না চাপড়ান
মহান ললনাজাতি যেন ভালো না বাসেন
এবং সর্বশেষ
মহান জনগণও যেন আমাকে গলাধঃকরণ না করেন'

ঠিক এই কবিতাটির সামনে দাঁড়িয়ে এক প্রকৃত কবির বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। আয়েশী অনুভূতি, অবক্ষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মন ভোলানো কথা কিংবা বাস্তবের কাছ থেকে পলায়ন প্রবণতা কবিকে ক্লীবতার কাছাকাছি নিয়ে যেতে সাহায্য করে। যেমন কাজের কাজ হবে তেমনি তার বিপরীতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এক এক সময় প্রশ্ন জাগে যে সত্যিই কি আমরা নিজেদের শেকড় চিনি? নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা যদি একাত্ম না হই তবে স্কুল পালানো পড়ুয়ার মতো সারাজীবন ভেসেই বেড়াব ও আমাদের সাহিত্য শিল্প নিয়ে গর্ব করার মতো কিছুই থাকবে না পরবর্তীকালে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন : 'আমাদের কালচারের অন্বেষনে তৃতীয় দুর্বলতা আরও গুরুতর- আন্তরিকতার অভাব। কালচারের সার্থকতা কালচারে, নিজের তৃপ্তিতে, আত্মার আনন্দে।' আসলে সব কিছুর জন্য কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। অত্যন্ত হিশেবের মধ্যে সব রেখে শিল্প সাহিত্যের সাধনা হয় না। ছকবন্দি জীবনের বাইরে গিয়ে যে সাধনা তাই শিল্প সংস্কৃতির জন্য প্রযোজ্য।

ঋজু চরিত্রের যে মানুষ এবং আত্মগর্বী নয় এমন মানুষ সমস্ত 'মহান'দের পরিহার করতে পারেন, উদাহরণ কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠী।

যে কবি শিকড়কে পরিহার না করে ও তার শিকড়ের বাইরে যে সংস্কৃতি তাকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে একাত্ম হয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ করে চলেন তাদের মধ্যে একজন ঈশ্বর ত্রিপাঠী। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার মুখবন্ধে মানবেন্দু রায় বলেন : 'ঈশ্বর ত্রিপাঠীও প্রায় তিন দশকের বেশি সময় লক্ষভেদী ছুটে চলেছেন কবিতার আশ্চর্য হরিণটির পিছনে। কিন্তু এই সোনার হরিণটিকে তিনি কোনদিন কোন প্রভুর কাছে উৎসর্গ করতে চাননি। প্রাতিষ্ঠানিকতা অথবা শাসক সম্প্রদায়-কারও তুষ্টির জন্যই শিল্পরচনার কথা তিনি ভাবেননি দুঃস্বপ্নেও। বরং নিজের মতো করে, নিজস্ব সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে, অপূর্ণতা এবং ব্যর্থতাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তিনি ভালোবেসেছেন, নিসর্গকে। এই ভালোবাসাই তাঁর অন্তহীন দৌড়ের একমাত্র স্মারক-ক্ষুধা, শ্রম, বেদনা আর অশ্রুর কালো রঙ যে ভালোবাসার শেকড় হয়ে ছড়িয়ে গেছে যে শিকড়ে প্রাণবীজ হয়ে উঠেছে লোকায়তের বৃষ্টিকণা, যে বৃষ্টিকণায় লীন হয়ে আছে ধার্মিকতা। অবশ্য ঈশ্বর ত্রিপাঠী 'ধার্মিকতা' বলতে বোঝেন মানবতার শুদ্ধ উচ্চারণ, যা অনির্বাণ শিখা হয়ে দুঃখের গাঢ় অন্ধকারেও হতাশার ব্যাপ্ত তমসায় জ্যোতি হয়ে ওঠে। আলো দেয়। ভালোবাসা দেয়। পথ দেখায়। মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়।'

৩.

ষাটের বিশিষ্ট কবি প্রয়াত মঞ্জুষ দাশগুপ্ত এক প্রবন্ধে সুন্দর কথা বলেছিলেন : কবিতা হল অনন্ত ম্যারাথন দৌড়, তার সামনে কোন গোলাপী রিবন নেই। এই দৌড়ে যাঁরা ছুটে চলেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই সম্মান পাওয়ার যোগ্য এ কথা বলা যায় না। প্রধানত পঞ্চাশের দশক থেকে মনোরঞ্জনের প্রবণতা যেভাবে লক্ষ করা যায় তাতে আজ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক কবিকুল তার ভেতর নিমজ্জিত, অল্প কিছু ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমীদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অন্য বিশ্বাস। যে বিশ্বাস ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কবিতায় পাওয়া যায়ঃ

'ভাত রাঁধতে রাঁধতে কবিতা তৈরি হয়
মুড়ি চিবোতে চিবোতে কবিতা তৈরি হয়
আমাদের কবিতা ভাত মুড়ির কবিতা

তবু এই কবিতাটি কোনভাবেই ঈশ্বর ত্রিপাঠী লেখেননি
এর প্রথম লাইন লিখেছেন পুরুলিয়ার নির্মল হালদার
দ্বিতীয় লাইন বাঁকুড়ার মুরলী দে
এবং তৃতীয় লাইন পানাগড়ের প্রকাশ দাস

কাটোয়ার রাজকুমার কি যোগ করবেন চতুর্থ?
লিখবেন ভাতের সঙ্গে শাকটুকু না থাকা
কিংবা মুড়ির সঙ্গে কাঁচালঙ্কা জোটাতে না পারার দীর্ঘশ্বাস।'

ঠিক এভাবেই বন্ধুত্বের হাত ধরে আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করে চলেছেন দীর্ঘদিন কবি। কবি চান যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা সকলেই লিখুন অসাধারণ কবিতা যা তাঁর বোধ ও আবেগকে তৃপ্তি দেবে, যা তাঁকে লিখতে উৎসাহিত করবে।

কবি যেহেতু একজন মানুষ তাই তিনি দোষ ও গুণ থেকে মুক্ত নন। কিন্তু প্রকৃত কবি জেনে নিতে চেষ্টা করেন তাঁর দোষগুণের পরিমাপ কতখানি। সবসময় নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তে বাস্তব দেখতে দেখতে ঠিক করতে পারেন তাঁর বোধ ও আবেগ এবং কাব্যশৈলী দিয়ে কতখানি তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। প্রকৃত কবির লক্ষণ হল একবৃত্ত ভেঙে আর এক বৃত্তে নিজেকে স্থাপন করা। এর জন্য তাঁর কবিতা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে না কিংবা তিনি একই কবিতার মধ্যে

ঘুরতে ঘুরতে সে কবিতা বারবার বিভিন্ন ভাবে লিখে আগাছা বাড়িয়ে তোলেন না। ফলে তাঁর নীতি আদর্শ বজায় রেখে নিজস্ব দর্শনকে আরো পরিশীলিত করেন। ভুল থেকে ঠিক পথে যাওয়া তাঁর একগুণ। এর ফলে তাঁর ভেতরে শেকড় শক্ত হয়; নিয়মিত অতৃপ্তি তাঁকে বিদ্ধ করে। তার ফলে কবিতাকে গভীর থেকে গভীরতায় তিনি নিয়ে যান ও মোক্ষের সন্ধানে প্রাণপাত করেন।

কবিকে পারিবারিক মানুষ ও সমাজের থেকে উঠে আসা তাঁর স্বজন ও শত্রু ছাড়াও প্রভাবিত করে স্থানীয় সামাজিক দিকগুলি। কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় মানবেন্দু রায় তাঁর স্থানীয় অবস্থান সম্পর্কে জানাতে গিয়ে লেখেন : পরাবাস্তব ছবির মতো এক ঘোর লাগা মফস্বল শহর। ভাঙাচোরা পথঘাট অদ্ভুতড়ে অলিগলি, প্রবাহিত জনস্রোত আর তাদের নির্বিকার প্রায় অবসিত জীবনযাত্রা সব নিয়ে যে শহর দুমড়ে মুচড়ে বেঁচে আছে। যে শহরে পথ হাঁটতে চোখে পড়ে বিবর্ণ রঙচটা সাইনবোর্ড সম্বলিত পুরাকালীন বিপণি সকল। আধুনিকবানিজ্য বায়ুর স্পর্শরহিত এক প্রায় স্থবির অনুন্নয়ণের অর্থনীতি যে শহরকে এই অধুনান্তিক শতকেও অবজ্ঞার কুয়াশার অন্তরালে হারিয়ে যেতে দিয়েছে। বিশ্বায়ণের টেলিবন্ধনের অদৃশ্য জালের ভাঁজে আটকে গিয়েও যে শহর এখনো প্রাচীন গ্রামীণতার খোলসকে অবলীলায় ত্যাগ করে যেতে পারেনি, যে শহর মানে উপচে পড়া বিষন্নতার মতো দারিদ্র, যে শহরের অর্থ না-পাওয়া খুঁটে খাওয়া মানুষদের শীতরাত্রির দীর্ঘশ্বাস, যে শহরকে এখনো মহানগরের ক্লেদপুঞ্জিত আর্বানিটি উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য অনায়াসে ছুঁড়ে মারে, সেই সাবঅলটার্ন শহরের ফিনিক্স আত্মাকে স্পর্শ করে আছেন, এক কবি এই শহরটির আধিক্লিষ্ট হৃদপিন্ডে। সেই স্পর্শ ক্রমে ক্রমে শহরে ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে সারা জেলায়।'

ঠিক একই দৃশ্যের আর একটি মফস্বল শহরে বর্তমান প্রাবন্ধিক তার শৈশব থেকে যৌবন কাটিয়ে আসার কারণে জানা আছে এক আধা ফিউডাল পরিবেশে থেকে তার থেকে কাটিয়ে উঠে নিজেকে বিকশিত করা কতটা কঠিন ও কতটা মানসিক শক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কবিতায় যে বিশ্ববীক্ষার খোঁজ আমরা পাই তাঁর কবিতায় তা এসেছে তাঁর মানসিক শক্তির কারণে। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 1992 সালে হির্শবর্গ থেকে এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেনঃ বিশ্ববীক্ষা আপনার মধ্যেও লক্ষ্য করেছি। যে যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছে সেখান থেকেই এই বোধের সঞ্চার সম্ভব। আজকে বিশ্বজগৎ লেখকের কাছে আমেয় দাবী নিয়ে তাকিয়ে আছে। সেই মর্মে আমাদের সবাইকেই তো সচেতন হতে হবে। বলাবাহুল্য, সেই চৈতন্য শিল্পে সরাসরি বা আড়াআড়ি বিম্বিত হবে কিনা, সেটা লেখকের মনন মর্জির উপরেই নির্ভর করে। একথাগুলি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর ওপর সুন্দর খেটে যায়। তিনি যাকে ভ্রষ্টাচার মনে করেছেন তাকে কঠোরভাবে পরিহার করে তাঁর মননমর্জিকে এক সত্য ভাবনার সামনে দাঁড় করিয়ে যে কাজ করেছেন তা তেমনভাবে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া য়ায় না বলে তিনি আমাদের সামনে অন্যরকম ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে ওঠেন।

৪.

হয়ত অন্যরকম হওয়ার কারণে ১৯৮৬ সালে এক প্রবন্ধে তিনি অসাধারণ তুলোধুনো করতে পারেন সেই সব স্বঘোষিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান অছি-দের। তিনি বলেনঃ সমস্যা হল যে, বাংলা সাহিত্যের প্রধান অছি আনন্দবাজার গোষ্ঠী বা দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক যুগান্তর গোষ্ঠী না হয় নিজেদের দলবাজির জন্য রাজা সাহিত্যের আলোচনা জিইয়ে রাখতে আজও আগ্রহী। কিন্তু এ ব্যাপারে বামপন্থী সাহিত্যপত্র বা সাহিত্য ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা কেন অন্য ধরণের নয় তা বোঝা কঠিন। পরিচয় বা অনুষ্টুপ পত্রিকায় সমকালীন সাহিত্য পর্যালোচনায় একবারের জন্যও গ্রাম বাংলার ভুলেও ভাবলো না যে, এক্ষেত্রে তাদের কতখানি দায়িত্ব ছিল। এক্ষণ বা তা থেকে মহানাগরিক এবং আনন্দবাজারের মতো একদেশদর্শী। উল্লেখ করা যেতে পারে আশির দশকে তিনি যখন একথা বলছেন তখন শতকরা নিরানব্বই ভাগ শক্তিমান কবি মনে করতেন ঈশ্বর ত্রিপাঠীর উল্লেখ করা পত্র পত্রিকাগুলোতে যদি মাথা গলানো না যায় তবে কবিজন্ম বিফল। তাই তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সাহিত্যের থেকে ওই সব পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রভুদের পায়ে তৈলমর্দন করতে সময় বেশি দিতেন। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে কারোর কারোর নাম ছড়ালেও পরবর্তীকালে তাদের বিরাট শূন্যের সামনে দাঁড়াতে হয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই ঈশ্বর ত্রিপাঠী। সে মানসিকতা নিয়ে নির্মাণ কবিতায় শেষ দুই স্তবকে তা উচ্চারণঃ

আমাকে আমার মতো থাকতে দাও
নিহিত স্বভাবে
যূথবদ্ধ কার্যক্রমে সায় জেনে
স্বাধীন সংগ্রামে

আমাকে আমার মত বাঁচতে দাও
যুদ্ধব্রত মাটির তলায় যত
অঙ্কুরিত ভ্রূণকে বাঁচাতে
(ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাব্যগ্রন্থ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত)

এ প্রসঙ্গে প্রয়াত কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত বর্তমান সংবাদ পত্রে ঈশ্বর ত্রিপাঠীর প্রবন্ধগ্রন্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে-র আলোচনা প্রসঙ্গে এক মন্তব্য করেছিলেনঃ ঈশ্বর ত্রিপাঠী ছদ্মনাম। বেদনা তাঁর প্রতিবাদে অসংলগ্ন নয় বরং বলা যায় তিনি ঠিক কথাটিকে বলতে জানেন যুক্তির উজ্জ্বল ছুরিতে শান দিয়ে। কবিতায় যদিও কখনও লিরিকধর্মী কিন্তু সার্বিকভাবে তিনি একটি অগ্নিগিরি। প্রবন্ধে তিনি উদাসীন দুর্মুখ এবং ফলত কোদালকে কোদাল বলতে ভালোবাসেন পরিণামের কথা চিন্তা না করেই। এই অগ্নিগিরি হিশেবে তিনি যে কলমের ছুরি চালিয়েছেন আশির দশকে তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করা উচিৎ নয়। তিনি তাঁর গ্রাম বাংলার সাহিত্যচর্চা প্রবন্ধে দীপ্তকন্ঠে বলেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন বলেন, মফস্বলে থেকে কিছু হয় না, তখন তাঁকে বোঝা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো এখন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কথা বলবেন। তিনি ব্যক্তিগত সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছেন। ফলত তাঁর পক্ষে এই বিকৃত ইতিহাস ধারনাই সুখপ্রদ। অথচ ঠিক একই ধরণের কথা বলা অথবা চুপচাপ থেকে যাওয়া আকাঙ্খিত নয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সৌভাগ্যবশত, মহাশ্বেতা দেবীকে দেখা গেছে প্রকৃত ইতিহাস চেতনায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষও ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতায় এই ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ওঁদের সীমাবদ্ধতা, ওঁরা লেখেননি এ প্রসঙ্গে যতটা উচিত ছিল।...সব মিলিয়ে গোড়ায় গলদ এখনও আমাদের গ্রাস করে রেখেছে।

১৯৮৬ সালের মে মাসে হলদিয়া থেকে প্রকাশিত বঙ্গোপসাগর পত্রিকায় যা প্রকাশ হয়ে ছিল আজ কিন্তু ২০০৮ সালের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্পাদিত সক্রেটিস পত্রিকায় (যদিও এখানে ঈশ্বর ত্রিপাঠী নামে তিনি সম্পাদনা করেননি, পত্রিকাটি তাঁর প্রকৃত নাম অধ্যাপক তারাপদ ধর হিশেবে সম্পাদিত হয়েছে) বর্তমানে ভাষা সংস্কারের ওপর তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নৈরাজ্যের ভাষা-র মফস্বলের বিপদ আপদ নামক অংশে তাঁর ভাষা আগের থেকে অনেক নমনীয় হয়ত বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে, কিন্তু তাঁর ভেতর অগ্নিগিরি এখনও অটুট। প্রায় এক যুগ আগে শ্রদ্ধেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার কোথাও মন্তব্য করেছিলেন, মফস্বলে থেকে সাহিত্যচর্চা হয় না। মনে পড়ে, আমরা মফস্বলবাসীরা সমবেতভাবে তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলাম ও লিখেছিলাম। প্রাথমিকস্তরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষা শিক্ষার হালচাল বিষযে খোঁজখবর নিতে শুরু করে আমরা বুঝলাম, মফস্বলে বসবাসের আসল সমস্যাটা হল দুনিয়ার সাম্প্রতিক সব কিছু সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ অবহিত না হতে পারা। বস্তুত, আমরা এই রাজ্যের অধিবাসী বংলা আকাদেমি কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছে শুধ নয় বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় আকাদেমির বানান বিধি (লিপির পরিবর্তন সহ) আবশ্যিক হয়েছে।

৫.

বদ্ধুদেব বসু তাঁর সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনের (১৯৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত) ভূমিকায় বলেছেনঃ সাহিত্য জিনিশটা মানুষের চিত্তের নির্যাস, আর মনের মহিমা এখানেই যে সে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না, অনেক বিরোধ, ব্যতিক্রম, অসংগতির মধ্য দিয়েই তার প্রকাশের পথ এঁকেবেঁকে চলতে থাকে। এইজন্য সাহিত্যকে যে কোনোরকম ফর্মুলার মধ্যে বাঁধতে গেলে বোধের বিকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। যথার্থ এই ভাবনার ভেতর দিয়ে যখন কবি বলেন তখন তিনি গড়ে তুলতে পারেন এক একটি অণুরণিত করার মতো কবিতা। কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কবিতার ভেতর যে পরিমাণ ভাঙচুর, বিরোধ ব্যতিক্রম ও অসঙ্গতি দেখা গেছে, তার ভিতর থেকে তিনি বুঝিয়ে ছাড়েন তাঁর কবিতার ব্যতিক্রমী দিকগুলি, যা নিদর্শন কবিতাগুচ্ছ-র কবিতাগুলোতে পাই।

অর্থনীতির ক্লাসে
ছাত্রছাত্রীদের আমি সযত্নে
নিদর্শন মুদ্রার সংজ্ঞা বুঝিয়ে দিই—
....

নিদর্শন মুদ্রার মতো
আমিও কি নিদর্শন কবি।
সমগ্র জীবন শুকনো কাঠ
হৃদপিন্ডে চাঙর পাথর
তবু শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে আরও
গেঁথে তুলি শূন্যগর্ভ
দেবতার স্বর্ণ ইমারত।
কিংবা,
রোজ সকালে ঘুম ভাঙলে
আমি একটি সুন্দর কবিতা লেখার কথা ভাবি
রবীন্দ্রনাথের গানের মতো
অথবা জীবনানন্দের কবিতার মতো সুন্দর
কিন্তু আমার জন্ম থেকে
আমি সত্যিকারের সুন্দর কোন জিনিস দেখিনি
সকালের সূর্যকে দেখে
আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে
দুপুরে তার অসহনীয় উত্তাপের কথা
.....
ফলত, আমি কখনও কোনও
সুন্দর জিনিস দেখতে পাইনি
পাইনি কোন সুন্দর দৃশ্যের স্পর্শটুকু
....
ভাবি একদিন না একদিন
কোন সুন্দরের অলৌকিক ছোঁয়াতেই
আমার এই ব্যধিমুক্তি ঘটবে
তখন হয়ে উঠবে সুন্দর কবিতা

কবির বহু আগের লেখা এই সব কবিতা তিনি যেভাবে নিজেকে ভেঙে ও কোন শব্দের চাতুরি নী রেখে নিজের প্রাজ্ঞতাকে পুরোপুরি ঢেকে আমাদের কাছে অনুরণিত করার মতো নিজের বক্তব্য তাঁর কবিতার ভেতরে পরিবেশন করেছেন তা কবিতা পিপাসু এ প্রজন্মকে দোলা দেবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, উন্মুখ পত্রিকার আয়োজনে গত ২০০৮ সালের মে মাসের ৬ তারিখে তাঁকে যে মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি স্মারক প্রদান করা হয় তাঁর শ্রেষ্ঠকবিতা বইটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে, সেখানে তিনি তাঁ অনুভব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেনঃ কোনদিন কোন পুরস্কার বা সম্মান মাথা নিচু করে নেওয়া উচিৎ নয়। নিশ্চয়ই সেই সংস্থা বা পত্রিকা তাঁকে উপযুক্ত মনে করেছেন বলেই তাঁকে পুরস্কার বা সম্মান দিচ্ছেন মনে রাখতে হবে। এ ধরণের অনন্য কথাবার্তা এর আগে কোন কবির কাছ থেকে শোনা গেছে বলে জানা নেই। এরকম কথাবার্তা আমি তাঁর সামান্য কিছু সান্নিধ্যে আরো কিছু লাভ করতে পেয়েছি। যা পরবর্তীকালে ভাবিয়েছে শুধু নয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়েছে। সে সঙ্গে কবির কবিতাগুলি পড়তে পড়তে বোঝা যায়। তিনি নিজেকে নিজে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করে চলেছেন যাতে সেই প্রকৃত কবিতার বা তাঁর কথায় সুন্দর কবিতা লিখে ফেলতে পারবেন। আবার কখনও তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে দেখি যা আমাদের কাছে সত্য বলে অনুভুত হয়ঃ

সব থেকে বিষময় জ্বালা—মনীষা
এবং আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ
সেই বিষপান করে, সেই বিষপান করে
মৃত্যুকে বরণ করছি।

অতঃপর আমরা প্রত্যেকেই সক্রেটিস।

(সক্রেটিস কবিতায় এক নম্বর কবিতার অংশবিশেষ)

তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে শিবনারায়ণ রায় এর দুটি চিঠি-র অংশ বিশেষ তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন, প্রথমটিতে চিঠির কোন তারিখ না থাকলেও একটি ১৯৮৭ তে লেখা হয়েছিল তা জানা গেছে। শ্রীরায় লিখেছেন: '...তোমার সততা, বেদনা, অনুসন্ধান, সঙ্গহীনতা, আদর্শবাদ, গভীর ব্যর্থতাবোধ-এ সবই তোমার কবিতাগুলোতে ফুটে উঠেছে, তবু মনে হয় এসব ছাড়াও তোমার মধ্যে কিছু আছে যা এখনও ভাষা পায়নি। আসলে সারা জীবনটাই তো হয়ে ওঠা। ভাষা তার যতখানি ধরতে পারে ততই ভাষাতে ব্যঞ্জনা আসে।' অপরটি লেখা ৩০-০৮-১৯৮৮ সালে, সেখানে তিনি লিখেছেনঃ তোমার লেখা পড়ে মনে হয় তুমি বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে তারপর যেন ঘুরপাক খাচ্ছ। নিজের ভিতরকার আগুনকে নিভতে দিও না। কিন্তু সে আগুন ক্ষোভের আগুন নয়, উত্তাপের আগুন, সততার আগুন, ভালোবাসার আগুন। তুমি আমাকে সম্মান করো, সেই অধিকারে একথা তোমাকে লিখছি।

দেখা যাচ্ছে মঞ্জুষ দাশগুপ্তের মত শিবনারায়ণ রায়ও ঈশ্বর ত্রিপাঠীর ভেতর আগুন দেখতে পেয়েছেন। তবে তিনি যে আগুন পেয়েছেন তা প্রধানত ক্ষোভের আগুন। ১৯৮৮ সাল মানে তখন ঈশ্বর ত্রিপাঠীর বয়স সাতচল্লিশ মাত্র। তাঁর বত্রিশ বছর বয়সে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ শুরু, ফলে সে সময় তাঁর গ্রন্থ জীবনের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। অর্থাৎ কবিতার প্রথমাবস্থা ধরা যেতে পারে। সে সময় তাঁর কবিতায় যে ভাঙচুর আমরা দেখি, তার প্রায় ভাঙচুরের মধ্যেই রয়ে যায় ক্ষোভ, হতাশা, পুঞ্জিত অভিমান ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সময় কি গল্প, কি কবিতা, কি প্রবন্ধ সবেতেই ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্ষোভের আগুন মানুষের কাছে, তা হয়ত বহু সময় উচ্চগ্রামে পৌঁছে যায় বা কিছু সময় তার ভিতর কবিতা খুঁজে নিতে কষ্ট হয়। তবে এক কঠিন বার্তা তিনি ছড়িয়ে দেন তার সাহিত্যে যা মানুষের উপকারে লাগবে বলেই। তিনি তাঁর নিজস্ব ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতেও রয়েছে মানুষের পক্ষে কথাঃ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ। সেই ঈশ্বর আমার ব্যক্তিগত। তিনি অনন্ত বিশ্ব ও ছোট মানুষের ছোটখাটো দুঃখ বেদনা। তিনি মহাপ্রকৃতির পূর্ণাভিমুখ্য, আবার পতঙ্গের পতত্র সম্ভূত গুঞ্জরণ। জড়ের সঙ্গে লীন হয়ে থাকা চেতনা থেকে গতিময় ব্রহ্মান্ডের নিরুদ্দিষ্ট আনন্দক্রীড়া। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নামে তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে তাতে ব্যষ্টি কবিতায় দেখেত পাই :

যে তুমি বিধ্বস্ত চিরদিন
খখনও জয়ী নও
পায়ে পায়ে বেড়ি আর বেড়ি—
যে তুমি ধাতু ও পেশী
ধ্বংস করে গড়ে তোল দ্বীপ,
তোমার মৃত্যুর স্তোত্রে
ভরে ওঠে হিরন্ময় শিল্প নগরী।

আবার ১৯৮২ সালে তিনভুবনের প্রেম নামে এক কাব্যগ্রন্থের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে-র কবিতায় পেয়ে যাই—

ব্ল্যাকবোর্ডে রেখচিত্র শর্তহীন আদেশ
দর্শন ও রাজনীতি আমি তা মানতে রাজী নই
কার আদেশ আগে জানব আগে বুঝব কোন সে আদেশ
নির্দেশ হলে কি কিছু ক্ষতি হত মানুষের যা হওয়া উচিত
বনোদের জগঝম্প দশ হাজার বছর শুনিনি
শিখর দেশের থেকে অকারণ আরো কেন নীচে লাফ দেব।

ওই সময়ে তাঁর কবিতায় দুই ধরণে সত্তা লক্ষ করা যায়, প্রথমটি উচ্চগ্রামের ও মানুষকে নাড়া দেওয়ার কবিতা অপরটি শিল্পিত ও নিম্নগ্রামের কবিতা। সে সময় তিনি সিরিয়াসভাবে কবিতায় এসেছেন আমরা দেখতে পাই সেটি রাজনৈতিক টালমাটালের সময়, তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট শাসন, নকশাল আন্দোলন, কংগ্রেসী সরকার ও জরুরী অবস্থার

দোলাচলে একজন তেজস্বী কবি যে পেলব কবিতা লিখে চলবেন তা ভাবা যায় না। স্বাভাবিকভাবে কোন শিল্পের তোয়াক্কা না করেই তিনি সে সময় প্রচুর উষ্ণগ্রামের কবিতা লেখার তাগিদ বোধ করেছিলেন শিল্পের কাছে। সে সময় এর অতীন্দ্রিয় চেতনাতেও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল, ওই সময় আমরা পেয়ে যাই ১৯৭৬ সালে ঈশ্বরবেদ, ১৯৭৮ এ কাঙ্খিত স্বর্গ ১৯৭৯ সালে অনন্ত মহিমা ও ১৯৮১ সালে পদ্য কথামৃত নামের চারটি অতীন্দ্রিয় চিন্তা সম্পন্ন কাব্যগ্রন্থ।

কবির প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ বিপন্ন বিস্ময়, একজন গ্রাম্য কবি (দুটি কাব্যগ্রন্থ ১০৭৩ সালে প্রকাশিত) এবং ভালোবাসর অভিমানে (১৯৭৬ সালে প্রকাশিত) তে আমরা বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার কয়েকটি কবিতা পেয়ে যাই যেমন বিপন্ন বিস্ময় কাব্যগ্রন্থে বিজয়াদশমী, শ্রী রামকৃষ্ণ-এর মতো আধ্যাত্মিক চেতনার কবিতার সঙ্গে পাই বাঁকুড়া ও ক্রীতদাসের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত কবিতা। পাশাপাশি পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থেও একই ছোঁয়া পাই। তবে দেখা গেছে এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে স্বাভাবিকভাবেই কাব্যমুন্সিয়ানা বেশ অপটু পরবর্তী অতীন্দ্রিয় চিন্তাসম্পন্ন কাব্যগ্রন্থগুলির থেকে। আমরা ঈশ্বর বেদ এ পাই চমকে দেওয়ার মতো আরম্ভ। প্রথম কবিতাতে চিনিয়ে দেন তাঁর অসামান্য মুন্সিয়ানাঃ

কি হবে আমার বেদ কি হবে আমার বেদান্তে
আমি সন্ধানে ফিরছি সেই অচিনে গাছের
আবৃত্ত চক্ষু যাঁর নির্নিমেষ পানপ্রীতি
উদধির সমাহিত চক্রে প্রতিবিম্বিত স্বীয় রূপ প্রভার
কিংবা ৪৪ সংখ্যায় কবিতায়
আনন্দে বিচরণ করি সমুদ্রের অবয়বে
প্রতিপালন করি উপজাত গল্প
আনন্দে স্বরূপ তুমি হে বরদেব তুমি অনন্ত এবং নিত্যপ্রভা
ঐ আনন্দ এবং প্রজ্ঞাই আমাদের কাঙ্খিত
উদারতায় প্রদান কর আমাদের জ্যোতি
নিমজ্জনের তমিস্রা ভেদ্য হোক
ঐ ক্ষুরধারায়।
কাঙ্খিত স্বর্গ-র ৫৩ সংখ্যার কবিতাঃ
আমাকে তুমিই গড়ো ব্যবহার করো পূর্ণ করো
বলেছি যদি অন্যবিধ জেনো সে আমার বালক অভিমান।
অনন্ত মহিমা-য় ঈশ্বরোপনিষদ পর্বের ১৬ সংখ্যার কবিতা
জিহ্বা পবিত্র হও, উষ্চারণ করো
অস্থি পরিত্রাণ পাওত অক্ষ ছুঁয়ে থাকো
অক্ষি, অশ্রু ঢেলে দাও, ধৌতশুভ্র করো

মানস তন্নিষ্ঠ হও, সখ্যে ও মধুরে।
পদ্য কথামৃত-র ৩৪ সংখ্যার কবিতায়
থাকি যেখানে রাখেন
খাই যা খেতে বলেন
আমি যে তাঁর হাতের পুতুল
সুখ এইটুকু, তিনিও তাহা জানেন।

প্রশ্ন থেকেই যায়, একজন কবি মানুষের কথা বলতে গিয়ে প্রথমাবস্থায় যে মানুষ ও ঈশ্বর এই দুই বিষয়কে নিয়ে ভাবছেন এবং লিখে চলেছেন দুই ধরনের কবিতা তা কি তাঁর দ্বিমুখী চিন্তার পরিচায়ক? এ বিষয়ে তাঁকে প্রশমন করলে জানা য়ায়, অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর শৈশব ও কৈশোর ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত করেন। ফলে সাধারণ মানুষের আর্থিক সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে তাঁর ভাবনা থেকে যায়। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর হওয়ার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবে মার্কসীয় অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট হন ও একটি বিশেষ সত্তা সেদিকে ধাবিত হয়, পাশাপাশি ঈশ্বর চিন্তা প্রথম থেকেই ভেতরে থাকার কারণ তাঁর মাতামহ ঈশ্বর ত্রিপাঠীর (যিনি ছিলেন দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিশ্রুত পন্ডিত, যাঁর নাম থেকেই তিনি ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন) প্রভাবে দীর্ঘদিন থাকার কারণে।

কিন্তু তিনি সেই চিন্তাকে একত্র করে সমাগত মানুষের কাছাকাছি তাঁর চিন্তা নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন ও এখনো করছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য আমরাতো আগেই পেয়ে যাই তাঁর ঈশ্বর চিন্তা সম্পর্কে লিখিত উচ্চারণে। এছাড়াও তাঁর বক্তব্যে আরো কিছু পাই, আমার সত্তায় দেশ-ঐতিহ্যের স্রোত নিমজ্জিত অকল্পনীয় কল্পনা যেমন তিনি, তেমনই পরাবাস্তব ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে তাঁর মূর্ত প্রকাশ কেবলমাত্র মনুষ্যত্বে—বিপন্ন ও বিস্মিত মানুষের জীব-জড় সম্বলিত প্রাণযাপনের ক্লেশ ও সম্ভোগে।

৬.

সাতের শেষ ও আটের এই দুই দশকের সন্ধিক্ষণে ঈশ্বর ত্রিপাঠী যে সাহিত্যকর্ম করে গেছেন বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে থাকতে পারে পদ্য কথামৃত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-র মুখ নিঃসৃত কথা নিয়ে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) পাঁচখন্ডে যে কথামৃত লিখেছিলেন তাকে ভিত্তি করে এই তিনফর্মার কাব্যগ্রন্থটি রচিত। ঈশ্বর ত্রিপাঠী এই কাব্যগ্রন্থটির নিজে লেখক হিশেবে দাবি করেননি, প্রচ্ছদে তাঁর নামের সঙ্গে অনুলিখিত জুড়ে দেন। তবে বইটির ভেতর তাঁর নাম লেখক হিশেবে উল্লেখ করা হয়। কলকাতার করুণা প্রকাশনী থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পড়ে এ কথা বলা যায়, এর আগে অধ্যাত্মবাদকেন্দ্রিক আর কোন কবিতার বই শব্দচয়ণ, আবেগ ও বোধের অনবদ্য ব্লেন্ডিং-র রচিত হয়নি যতদূর জানা আছে। প্রচ্ছদের পেছনে বইটির পরিচিতিতে প্রথমেই বলা হয়ঃ ভূতাবিষ্ট নয়, দেবাবিষ্ট ঈশ্বর ত্রিপাঠী ৪৪টি কবিতা লিখেছেন মাত্র ৩দিনে। তবু এগুলিকে কবিতা না বলাই ভালো। বলা যেতে পারে শ্লোক। কিংবা ভারতীয় দর্শনের সারাৎসার। সব শেষে তাঁরা লেখেন: ৩ ফর্মার এই ছোট বইটি আধুনিক বাংলা ভাষার হাহাকারে একিট মূর্ত দিকনির্দেশ। তাঁদের বলায় কোন যে বিশেষভাবে জ্ঞাপন ছিল না তা কোন সচেতন পাঠক যদি কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করেন তবে এই কথাগুলিকে সমর্থন করবেন বলে বিশ্বাস। তাঁর কবিতার শৈলীতে আহামরি কোন চমক নেই কিন্তু গভীর অনুপ্ররণা সে শৈলী ছড়িয়ে দিতে পারে। যা হয়ত আমার মতো অনেক কবিতা পাঠক বুকে ধরে রাখতে পারবেন। তাঁর আরম্ভের কবিতাটি অংশ বিশেষ যদি দেখিঃ

ওই পাখিকে দেখাও পাখি
সে চেয়ে থাকে শুধু চেয়ে থাকে
শুধু ওপরে, নামে যাকে চাওয়া বলে
ভেতরে পাখির পাখি
সবটা রয়েছে সেখানে।

কতটা আবিষ্ট হলে এই কবিতা লেখা যায় তা যে কোন কবিতাপ্রেমীর নিশ্চয়ই বোঝা অসুবিধের নয়। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত যাঁদের আত্মস্থ, সঙ্গে কবিতা যাঁদের বোধে আছে তারা বুঝতে পারবেন কথামৃতের মূল নির্যাসটিতিনি এই পাঁচটি লাইনে ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠকের কাছে, যা বুকে না রেখে পারা য়ায় না। ঈশ্বরভিত্তিক যে সব কবিতা লেখা হয়েছে কিংবা এখনও লেখা হয় তা (রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম) পদাবলীর পর্যায়ে পড়ে আছে। সে জায়গায় বিশেষ ব্যতিক্রম পদ্য কথামৃতঃ

কাঁদো যেমন পাতায় পাতায় হাওয়া
ঝড়ের বেলা বনের বুকে বুকে
মনের ভেতর দরজা কুলুপ এঁটে
যেদিকে নেয় সেদিকে যাও সুখে
মনে তোমার রূপ নেই কোন রস নেই
উন্মনা মন কুড়িয়ে আনো বেঁধে
ধারণা তবু তাকেই দিগন্তরে
যেমন পদ্ম মেঘহীন রোদে ফোটে

কিংবা:

তুমি কাকে নিয়ে আছ, কাকে নিয়ে ভানছ ধান দিনরাত
মশগুল
গান গাইছ, গাইতে গাইতে ধান ভেনে ডুবে আছ
তুষের তলায়

অথবা

আমি জগৎ ও জগতের বাইরে, বাইরে না ভেতরে
ভাবতে ভাবতে দেখি, দেখতে পাই ঝড়

ঈশ্বর ত্রিপাঠী কথামৃতের মূল অবস্থানে দাঁড়িয়ে ও তাঁর মূল ব্যাখ্যাগুলোকে বলতে গেলে অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজের ভেতর শানিত করে তাকে একটি বিন্দুতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালে ছোট করা হবে।

কেবল ঈশ্বর নয় জগতের সামগ্রিক জীবন ও জড়ের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালোবাসা নতুনভাবে আমাদের কাছে আস্থিকত্বের ব্যাখ্যা হাজির করে। ফলে কবিতাগুলো স্রেফ কবিতা নয় জীবনের এক মন্ত্র হয়ে ওঠে বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই মন্ত্র যেন পাইঃ

শব্দ নাদ ব্রহ্ম তার পরতে ধায়
প্রতিটি বিন্যাসে আলো জ্বলে

মনে হয়, কবি যে তিনদিন আবিষ্ট ছিলেন, সেদিনগুলো নিয়ে আসতে তাঁর দীর্ঘদিন সাধনায় কাটাতে হয়েছিল, সে সাধনা শুধুমাত্র পদ্মাসনে কোন বিগ্রহের প্রতিকৃতির কাছে বসে ঈশ্বরের নাম করে নয়, সে সাধনায় জড়িত ছিল নিভৃত ধ্যান, বোধ ও শব্দ ব্রহ্মের সংমিশ্রণ। সে কারণে তাঁর কাজ একজন সন্যাসীর থেকে কোন অংশে কম নয়। ঈশ্বরের ডাকার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মনে বলেন কোণে গিয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন; ঈশ্বর ত্রিপাঠী তার মধ্যে মনে ধ্যান করা বেজে নিয়েছিলেন। যার মধ্যে সামাজিক অবস্থান ও কাজ থেকে পালানোও চলে না। কারণ সামাজিক জীবনে তিনি তখন ছিলেন বাঁকুড়ার এক মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। টাকা কড়ির বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ এই বিপরীত বিষয় একসঙ্গে রেখে তিনি কি করে এ ধরণের সাধনায় রত হয়েছিলেন ভাবতে অবাক লাগে। কবি হয়ত সে কারণে পদ্যকথামৃতের শেষ কবিতার শেষ স্তবক বলে ফেলেনঃ

দরজা খুলে গেলে ঘর বাইরের মতই
একাকার আমরা ঈশ্বরে
তার আগে ঘরে তিনি বাইরে আছি
আমরা সকলে।

যাঁরা ঈশ্বর ত্রিপাঠীর এ ধরণের লেখার সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের ক্ষেত্রে এই কথামৃতের কবিতা বেশ অদ্ভুত ঠেকতে পারে। কেউ কেউ হয়ত দ্বিচারিতা বলে ঠাউরে নিতে পারেন। এক ঋজু ও সারাজীবনে জীব ও জড়ের প্রেমে যিনি মশগুল, তাছাড়া তাঁর কবিতার গঠন দেখে অনেকে নাস্তিক মনে করলেও দোষের হবে না। কার্যত এই দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত বাণী জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, পুরোপুরি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে ঈশ্বর আছেন কিন্তু জীবন বাদ দিয়ে নয়। কোন সময়ই তাঁর পদ্য কথামৃত পড়ে মনে হয়নি তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বর স্তুতি করার জন্য এ লেখা লেখেন বা তিনদিন ধরে আবিষ্ট থেকেছেন। প্রতি পরতে পরতে রয়েছে জীব ও জড়ের কথা, তাদের কাছে তাঁর একটাই প্রণতি তারা যেন ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমানের কাছে শ্রদ্ধানত থাকে।

গাঁ গঞ্জে থাকা ও নিজের কবিতার প্রচারের বিষয়ে প্রকাশক ও একশ্রেণীর কবিতার দাদা দিদিদের কাছে ঘোরাঘুরি ও তাদের তোষামোদ না করার কারণে যথেষ্ট প্রচারিত ও তথাকথিত বিখ্যাত তিনি নন এ কথা বলতেই হয়। সে সঙ্গে বলতে হয় তাঁর এ্রি বিশুদ্ধ পথ চলার মানসিকতা সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও বহু বিদগ্ধ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পদ্য কথামৃত নিয়ে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট চারণ কবি বৈদ্যনাথ সুন্দর একটি কথা বলেছেন : এমনি গভীর থেকে গভীরে তাঁর উত্তরণ, ক্রমশ যেন মনে হয়, তিনি দক্ষিণেশ্বরের বারান্দায় কবি রামকৃষ্ণের মুখোমুখি বসে কবিতা মেলা বসিয়েছেন। দুঃখ লাগে, এ ধরণের কাব্যগ্রন্থ জনপ্রিয় হয় না ধার্মিক মানুষদের কাছে, কারণ নিভৃতে কে কি কাজ করে যাচ্ছেন তার খোঁজ তাঁরা রাখেন না। ধর্মীয় সংগঠনগুলো কোন দায় নেই এ ধরণের বই সংগ্রহ করে তাকে প্রচার, পত্রপত্রিকায় সমালোচনা এবং বিজ্ঞাপিত করা।

৭.

ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কাব্যজগতের প্রথম পর্বে যে দোলাচল তাঁর কবিতায় লক্ষ করি তা অনেক বেশি উপলব্ধি করা যায় তাঁর নির্বাচিত কবিতা (প্রকাশঃ ১৯৮৫) পড়ে ফেললে। এই গ্রন্থে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ বিপন্ন বিস্ময় (প্রকাশঃ

১৯৭৩) থেকে জিভ ও চাল ডাল (প্রকাশঃ ১৯৮৪) পর্যন্ত মোট দশটি কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতা সহ বেশ কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত কবিতার ভূমিকায় তিনি যে সময় যা লিখেছিলেন তাতে করে আমরা পরবর্তী ঈশ্বর ত্রিপাঠীকে পেয়ে যাই। তিনি যে পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য কবিতায় আসেননি তাঁর সে সময়ের কবিতার উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করিঃ কবিতা সভ্যতার সব সংকীর্ণতা দূর করে। পৃথিবীর সমস্ত সীমানা ভেঙে দেয়। কবিতার বাস্তব অবাস্তব হয়ে ওঠে। মায়ারূপ নেয় সত্যের। কবিতা একা মানুষের ভাষা। তবু সে বাঙ্ময় করে তোলে মানবতার প্রবাহকে। সারা জীবন এই কবিতার ধ্যানমন্ত্র খুঁজে বেড়িয়েছি আমি। বলা যায় কবি সে সময় থেকে বিশ্ববীক্ষার দিকে ক্রমশ ধাবমান, তার এক সামান্য বার্তা এই কথাগুলি। ভেতরের আগুন তিনি যে কোনদিন চেপে রাখতে চাননি আর সে আগুন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সম্মিলিত জ্বালা যন্ত্রণা যে তাঁকে প্রভাবিত করে এক অন্য আগুনের ভেতর পোড়ায়, তা আমরা একথার ভিতরে প্রত্যক্ষ করি। মানবতার প্রবাহকে তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন।

তাঁর কবিতা নীতিবোধের বাইরে নয়। কোন দিনই তিনি কবিতার বাইরে দাঁড়িয়ে কবিতা লেখার মতো হাস্যকর কিছু করেননি। ঠুনকো বিষয়, অসুস্থ মনোবিকলন, মধ্যবিত্ত বিলাস, পাতি বুর্জেয়া চিন্তাধারাকে সমর্থন করে কবিতা লেখার প্রচেষ্টা নেননি। যা অহরহ আমরা পাই ও তা কবিতা বলে স্বীকৃতি দিই। ঈশ্বর ত্রিপাঠী কবিতা ধ্যানমন্ত্র খুঁজে বেড়ানোর কাজ এখনো করে চলেছেন অর্জুনের চোখ দিয়ে। যার ফলে আমরা তার কাছ থেকে পাই অনেক অমূল্য ফসল। উপলব্ধি নামে আট লাইলেন কবিতা এ সম্পর্কে না তুলে ধরলেই নয় :

যে পাখি, নাম যা লেখ, আমি তাকে পাখি বলে ডাকবো।
যে কবি, মানুষ যেমন হোক, কবি ছাড়া তার অন্য পরিচয়
আমি লক্ষ করব না।
আমি কখনও ফুলকে বলবো না মানুষের উপকার করতে।
ফলের কাছে শুনতে চাইবো না পাতার গান।
আরো কিছুদিন পরে আমার আত্মা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে
আগামীর জন্যে থাকবে শুধু এই উপলব্ধি গুলি
আমার এই আমি শরীরের জ্ঞান গাছালি।

এ ধরণের কবিতা লিখতে গেলে অনেক সময় কবিতা বিবৃতিমূলক হয়ে ওঠে, তখন তা কবিতা থেকে সরে যায়। কবি সে বিষয়ে ধীরে ধীরে সচেতন হয়েছেন। আসলে তিনি একদিন সব কিছু পেয়ে যাওয়ার প্রত্যাশী নন, ভুলের মধ্যে থেকে ঠিক পথে আসার যে মজা তা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। নির্ভর করেছেন সময়ের কাছে ও পরিণত জ্ঞানের জন্য অজস্র নিবিড় পাঠ ও দিনের পর দিন সামাজিক পট পরিবর্তনের দিকে সচেতন হয়েছেন। ফলে ভারতের প্রতিটি নিরক্ষর মানুষের ঘৃণার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত তাঁর কাব্যগ্রন্থ জিভ এবং চাল ডাল তে অত্যন্ত উচ্চগ্রামের কবিতা পাওয়া গেলেও সেখান থেকে কবিতা সরে আসেনি। সে সময় দেখা গেছে অনেক কবিই এ ধরণের কবিতা লেখার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কবিতা স্টেটমেন্ট ছাড়া কিছুই হয়নি। উক্ত কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার তার ব্যতিক্রম খুঁজে পাইঃ

আমাদের এই অতি ব্যক্তিগত সংলাপগুলিও
অন্য সকলের নাতিপুতিদের উছলে পড়া ভাঁড়ারে
চিরকালের জন্য না হলেও অন্ততঃ অনেক কালের জন্য
এই খাপখোলা জিভে এবং ঘরে চাল ডাল বাড়ন্ত
এগুলি কেবলই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে
সূর্যতাপ ও আনন্দের খোরাক জোগাবে।

কিংবা এই গ্রন্থের আরাধ্যা যে সহস্রারে-র ১২নং কবিতায় পাইঃ

মূলে যার ঘাটতি আছে তাকে তো অসর দিয়ে ভরাতেই হয়
দিনক্ষণ
তাই তারা গহনা চায়, চায় দামী জামাপ্যান্ট, শক্তি ও শাসন
প্রোমোশন
তুচ্ছ চাচ্ছিল্যের জন্য মাতামাতি হানাহানি করে দুঃখ পায়

পাড়ে গাল
নেতার চামচা হয়ে ঘুষ খায় সর্বক্ষণ লালা ঝরে পড়ে
যে কোন কিছুর
তবুও নিন্দায় কোন কথা বললে তারাও পাকায় চোখ
বাড়ায় আঙ্গুল

ভাষাপ্রেমে নামে তাঁকে কেন্দ্র করে এক সংকলনে তাঁর জীবন ও তথ্যপঞ্জীতে

জানা যায় যে, বাড়িতে অনটন থাকায় তাঁর মামা রবিনাথ ত্রিপাঠী নিজের কাছে তাঁকে নিয়ে আসেন ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। হাইস্কুলে পড়ার সময় তাঁকে ১০ কি.মি. পথ হাঁটতে হত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় ছাত্র পড়িয়ে খাবার জোগাড় করতেন। তাঁর এই নিকষ জীবনের কারণে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন তার থেকেই এসব সার্থক কাব্যাংশ উঠে আসা স্বাভাবিক। কেবল ভালোবাসা বা নিটোল আবেগ নয়, অবিরাম ঘাত প্রতিঘাত একজন কবিকে পরিণত ও তাঁকে মোক্ষে পৌঁছোতে সহায়তা করে। উদ্দেশ্যহীন ছুটে চলা যাদের উদ্দেশ্য তিনি তাদের সঙ্গে নাম লেখাতে চাননি বলে ঈশ্বর ত্রিপাঠী এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কবিতার ক্ষেত্রে।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-য় স্থান পাওয়া শেষের দিকের কবিতাগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন দেখা যায়। সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্র বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর কাব্যশৈলী ও নীতিবোধ কিভাবে ভিন্নধরণের কবিতায় রূপান্তরিত হয়। অনেকাংশেই তিনি তুচ্ছ করেছেন নীরবতা, কিছুটা হয়ত তা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করতে বাধা দেবে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবিতাপ্রেমী ঠিক খুঁজে নিতে পারবেন সেই রস যা দুর্লভ। দাঁড়িয়েছিলাম কবিতায় পেয়ে যাইঃ

একটা বড় কিছুর জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হয়
নীচু মুখে বলার মত জয়ও সত্য হয়ে ওঠে নি
বালি খুঁড়তে খুঁড়তেই শেষ হয়েছে সারাৎসার
হাঁটতে হাঁটতে মাটি নিয়েছে হাড়
মিথ্যার বাতাসে সৌন্দর্য শ্রী হারিয়েছে অনেক বেশি।

কবির নির্মম নিষ্ঠুরতা নিয়ে আগ্রহাতিশয্য করার ইচ্ছে ছিল না বলে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে তেমন আকর্ষণীয় হয়নি। হয়ত আবৃত্তিশিল্পীরাও (ব্যতিক্রমী বাদ দিয়ে) তাঁকে পরিহার করবেন কারণ হাততালি যোগ্য কবিতা তাঁর নেই। সততা এমনই, সে কারো তোয়াক্কা করে না।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী কাছে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৪ আগষ্ট, ১৯৮২ সালে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন: ঋক অথবা শায়েরী অনন্ত মহিমা এবং পদ্য কথামৃত ত্রিলজিতে আপনার কবি স্বভাবের সমগ্র অনুভব করলাম। মিষ্টিক এই ধারাতেই প্রার্থিত বিবর্তন। একটি স্বভাবতায় আপনার বৈভব উপলব্ধি ও রূপশিল্প শেষোক্ত রচনামালা আমার কাছে অনবদ্য ঠেকেছে। প্রেরণার সঙ্গে প্রকরণের এই যোগযুক্ততা এই মুহূর্তের বাংলা কবিতার অন্যতম এক যোজনা। আপনাকে গভীর অভিনন্দন জানাই।

শ্রাবণ ১৩৮৬ সালে প্রকাশিত ঋক অথবা শায়েরী ক্ষীণতনু বইটিতে খুঁজে পাই অন্য দ্যোতনা। এ যেন ঠিক সামবেদের শ্লোকগাথা নয় অথবা সঠিক শায়েরীও নয় অথচ অন্য এক মুগ্ধতায় পৌঁছে দিতে চায়। এই নিজস্বতা ঈশ্বর ত্রিপাঠী অর্জন করেছেন বহুশ্রমে, তার সামগ্রিক চর্চার দিকে তাকালে আমরা তাকে কেবল পন্ডিত বলে ভুল করতে পারিনা, সে সঙ্গে মানবতার গুণটি তাঁকে আমাদের অন্যভাবে চিনিয়ে দেয়। উক্ত বইটির মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে ১০টি সর্বনিম্ন দুটি লাইন ও সর্বোচ্চ বারো লাইনের নামহীন কবিতা বোধের কেন্দ্রে পৌঁছোতে সহায়তা করে। বইটির প্রথম কবিতায় পাইঃ

চোখ
নীচের ক্লান্তি
ভেতরে ভয়
পাতায় ভালোবাসা।

বহুলাংশে জেন কবিতার কথা মনে করায় কিছু কবিতায়, তার মধ্যে একটিঃ

সারাদিন রৌদ্র ঝিলমিল
সারারাত চাঁদের মৃগয়া
রৌদ্র অর্থে স্মৃতি প্রসন্নতা
চাঁদ থেকে ঝরে বৃষ্টি ফোঁটা।

তাঁর এই পর্যায়ের কবিতার ভেতর আমরা খুঁজে পাচ্ছি এক বিপরীত উপলব্ধি, যা আমাদের প্রাত্যহিক ভাবনার বাইরে যেতে উসকে দিতে পারে। তাঁর কবিতা কতখানি আস্তিক অথবা কতখানি নাস্তিক এ ভাবনা বাদ দিলেও আমরা সাধারণেরা তাঁর কবিতা পড়ে অন্য মগ্নতায় যেতে সাহায্য পেতেই পারি। এই গ্রন্থের চার লাইনের দুটি অনুপম কবিতাঃ

শহরে গোধুলিয়া উৎসব চলেছে প্রত্যহ
নাচের তালে কেমন উঠছে নামছে মেয়েদের পা
যুবক বৃদ্ধ পুরুষদের গালেও যেন কেউ
আনন্দরঙের বাটি উপুর করে দিয়েছে।
এবং কাল সারারাত আমি প্রার্থনা করেছি আমার সন্তানের জন্য
প্রার্থনা কার কাছে?
চারশো ষাট কোটি বছর ধরে এই প্রশ্নটি
আমার হৃদয় এবং মেধাকে কুরে খাচ্ছে।

১৯৭৯ সালের বর্ষ শেষে অর্থাৎ ঋক অথবা শায়েরী-র সমসময়ে প্রাকাশিত হয় অনন্ত মহিমা। বলা যেতে পারে ওই সময়ে ঈশ্বর ও মানুষ যেভাবে তাঁকে আকর্ষণ করে তা বেশ ব্যতিক্রমী ব্যাপার। অনন্ত মহিমা-র ভেতরে অনেক সময় মনে হয়েছে বোধ ও আবেগ সব সময় এক মাত্রাতে আসেত পারেনি, কারণ এই কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় গভীরতার অভাবে দেখা গিয়েছে। যেমন ২৫নং কবিতার শেষে তাঁর উচ্চারণঃ

নিষ্ঠুর আঘাত হেনে বারবার ফেরাই তোমাকে
তবু বারংবার এসে আমার দুয়ারে যাচ্ঞাকারী
চোখের কোণার জলে টলমল ব্যর্থ অভিমানে
আমার স্বীকৃতি ছাড়া তুমি যেন সত্যই বালক
অনন্তঃ বালকোচিত মানি তাই প্রজ্ঞা অবশেষে।

অবশ্য সেখান থেকে উত্তরিত হয়ে তিনি ঋক ও শায়েরী ও পদ্যকথামৃতের কাছে এসে পড়েছেন তার চেষ্টা, ধৈর্য ও নিভৃত সাধনার গুণে, যা শিক্ষনীয়।

পাশাপাশি ওই কাব্যগ্রন্থের ঈশ্বরোপনিষদ নামে ২৪টি ছোট কবিতার সিরিজে আমরা দেখতে পাই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কিছু বাণী টানটান কবিতায় তিনি নিয়ে এসেছেন। মানুষ ও ঈশ্বর এই দুই দিক পরিপূর্ণভাবে জানার জন্য তাঁর সাধনা সেখানে সার্থক হয়ে ওঠে, সেরকমঃ

কাছিমের ডানাগুলি আড়ায় ওখানে
কাছিম রয়েছে জলে নিশিত জঙ্গলে
আকাশের নীল নয় চটচটে কালোয়
রোমাঞ্চে ও বিতৃষ্ণার অন্ধ আধিপাঁকে।
কাছিমের মনঘুড়ি সুতো ছেঁড়া ডিমের লাটাইয়ে।
নয়তো,
ঘটির মার্জনা করো, মার্জনা চেয়ে নাও
আগে অনুরাগ আসুক, তবে তো অগুরু গন্ধে স্নান।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী এমনই এক কবি তাঁকে বিষন্নতার কবি গর্জনের কবি, নির্জনের কবি ইত্যাদি ইত্যাদি বিলাসী বিশ্লেষনে বেঁধে ফেলা যায় না। তিনি কেবলই কবি, তাঁর ভেতরের কবিতাকে তিনি কোনদিন নিয়ন্ত্রণ করার কিংবা নিজেকে প্রচার সচেতন করার দিকে নিয়ে যাননি। ফলে সেখানে কোন চালাকির গন্ধ পাওয়া যায় না। সে সব কবি প্রচারহীনতাকে সহ্য করতে পারেন, তাঁদের থেকে বেশি শক্তিশালী কবি আছেন বলে জানা নেই।